গার্হস্থ্য আশ্রম ও শ্রীরামকৃষ্ণ

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

ভারতের চতুরাশ্রমে গার্হস্থ্য আশ্রমই মেরুদণ্ডস্বরূপ। চতুরাশ্রমের বাকি তিনটি আশ্রম এই আশ্রমের উপর নির্ভরশীল। শুধু পরিপালনের সূত্রেই নয়, অন্য তিনটি আশ্রমের আশ্রমিকদের জোগানও আসে এই আশ্রম থেকেই। এই দিক থেকে গার্হস্থ্য আশ্রমের মুখ্যতা ও মান্যতা সর্বজনগ্রাহ্য। এই আশ্রমের অর্থ শুধু গৃহবাস নয়, এর পরিধি ব্যাপক। গার্হস্থ্য হল স্বামী-স্ত্রী, পুত্রকন্যা ও পরিজন, সেইসঙ্গে অর্থোপার্জন-ভাবনা, ভোগাকাঙ্ক্ষা, মানযশ, দুঃখদারিদ্র্য ইত্যাদির এক জটিল সমাহার এবং সর্বোপরি এক দৃঢ় বন্ধন যা মায়াপ্রভাবে অনুভূতও হয় না। ''কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ/ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।'' এই বৈচিত্র্য ও তার রহস্য উন্মোচনের জন্যই ঈশ্বরাবতারকে ধরাধামে আসতে হয় বারবার।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন আশ্রম আশ্রয় করে পৃথিবীতে ছিলেন? তাঁর জীবনে চারটি আশ্রমই পরিস্ফুট আবার তিনি এই চতুরাশ্রমের অতীত। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তিনি অটুট ব্রহ্মচারী এবং আজীবন শিক্ষার্থী। গার্হস্থ্যাশ্রমে তিনি মাতা, স্ত্রী প্রভৃতিকে নিয়ে গৃহকর্তব্য পালনে আদর্শস্বরূপ। বানপ্রস্থী হিসেবে সক্রিয় সংসারের বাইরে তিনি গঙ্গাতীরে দেবমন্দিরে ঈশ্বরচিন্তায় কালাতিপাত করেন। আর সন্ন্যাসের মুখ্য ঐশ্বর্যে তিনি ঐশ্বর্যবান—ত্যাগীশ্বর। এছাড়াও এই চতুরাশ্রমের বাইরে তিনি বাহ্যজগৎ ও ঐশ্বরিক জগতের মধ্যে 'বাচ' খেলছেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দের মতে জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যে সেতু হয়ে বিরাজ করছেন। তাঁর আশ্রমের সংজ্ঞা নিরূপণই দুরূহ, তাই বিদ্যাসাগরমশাই যখন কথামৃতকার শ্রীমকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি ''কিরকম পরমহংস?'' তখন শ্রীম উত্তরে বলেন ''তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ, লালপেড়ে কাপড় পরেন, জামা পরেন, বার্নিশ করা চটি জুতা পরেন, রাসমণির কালীবাড়িতে একটি ঘরের ভিতর বাস করেন, সেই ঘরে তক্তপোশ পাতা আছে— তাহার উপর বিছানা, মশারি আছে, সেই বিছানায় শয়ন করেন। কোন বাহ্যিক চিহ্ন নাই— তবে ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না। অহর্নিশ তাঁহারই চিন্তা করেন।'' এর সঙ্গে আমরা যোগ করতে পারি—সেই অহর্নিশ ঈশ্বরানন্দের ভাগ এই দুঃখী জগদ্‌বাসীকে দিতে তিনি ব্যাকুল, তাই যখন মন বাহ্যজগতে বিরাজ করে তখন এই সংসারমগ্ন মানুষগুলিকে এই আনন্দের ভাগী কী করে করা যায় কেবল সেই চিন্তা করেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে অর্জুনকে

বলেছেন— যদি তুমি ঈশ্বরেরই আরাধনায় মগ্ন হও তবে সত্যই ঈশ্বরলাভ করবে এ আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি (''মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে'')। শ্রীরামকৃষ্ণও ঠিক এইরকম বলেছেন : ''ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সত্য বলছি—দর্শন হয়।'' এ পর্যন্ত বলেই হতাশ হয়ে বলছেন : ''একথা কারেই বা বলি—কেই বা বিশ্বাস করে।'' কবির ভাষায় ''আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুধাইল না কেহ।'' আকাঙ্ক্ষা না থাকলে কে বা জানতে চায়, বিশ্বাস তো দূরের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠিবাড়ির ছাদ থেকে আকুলপ্রাণে ডাক পাঠিয়েছিলেন তাঁর সম্পদের ভাগ নিতে। শুদ্ধসত্ত্ব বালকেরা আসার আগে অনেকে মিলেছিলেন তাঁর সঙ্গে। পণ্ডিত পদ্মলোচন, কর্তাভজা বৈষ্ণবচরণ, তান্ত্রিক গৌরী পণ্ডিত, নৈয়ায়িক নারায়ণ শাস্ত্রী, নামে বিশ্বাসী কৃষ্ণকিশোর প্রমুখ। এছাড়াও ঈশ্বরভক্ত, ঈশ্বরের নাম করে এমন কারও কথা শুনতে পেলেই শ্রীরামকৃষ্ণ যেতেন তাঁর কাছে। গিয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে। ''আমি লক্ষণ দেখবার জন্য দেবেন্দ্রকে বললুম, 'দেখি গা, তোমার গা।' দেবেন্দ্র গায়ের জামা তুললে, দেখলাম—গৌরবর্ণ, তার উপর সিঁদুর ছড়ানো।'' ঈশ্বরীয় কথা কিছু হয়েছিল কিন্তু অভিমানের প্রাচীর ভেঙে দেবেন্দ্রনাথ মিলতে পারলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের তখন ভক্তি-ভক্তের সন্ধানে আকুলপ্রাণ। একদিন বাগবাজারে দীন মুখুজ্জের বাড়ি গিয়েছিলেন। বর্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত পদ্মলোচনের সঙ্গেও মিলেছিলেন। ''এত জ্ঞানী আর পণ্ডিত, তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না! কথা কয়ে এমন সুখ কোথাও পাই নাই।'' মিলেছিলেন বৈষ্ণবচরণও। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধক। কলকাতার পণ্ডিতসমাজে তাঁর প্রবল খ্যাতি। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার ভাবাবস্থায় তাঁর কাঁধে বসেছিলেন, সেই স্পর্শে তাঁর ভাবান্তর হয় ও তিনি স্তুতি করতে থাকেন। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন : ''আমি এক-একবার ভাবি যে, আমি কি জানি যে এত লোকে আসে! বৈষ্ণবচরণ খুব পণ্ডিত ছিল। সে বলত, তুমি যে-সব কথা বল সব শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তবে তোমার কাছে কেন আসি জানো? তোমার মুখে সেইগুলি শুনতে আসি।'' উচ্চস্তরের সাধক, তাই 'স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্ম' থেকে বিনিঃসৃত হলে যে শাস্ত্রীয় কথাগুলি শক্তিপূত হয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে তা জানতেন। ঠিক একইভাবে মিলেছিলেন গৌরী পণ্ডিত আর নারায়ণ শাস্ত্রী। দুজনেরই জাগ্রত বিবেক ছিল, তাই এই মিলন শেষপর্যন্ত তীব্র বৈরাগ্যের উদয় করে দুজনকেই ঘরছাড়া করেছিল। নারায়ণ শাস্ত্রীর নীরব গোপন প্রস্থান আর গৌরী পণ্ডিতের শ্রীরামকৃষ্ণের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে মুক্তির পথে যাত্রা।

সেইসময় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবহিত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনরকম ভাগ দেখি। প্রথম দল জানেন যে দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগলা বামুন আড়াইশো ছেলের মাথা খেয়েছে এবং যদি বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে কখনও দক্ষিণেশ্বরের সেই ঘরটিতে গিয়ে হাজির হয়েছেন তো দু-একটি কথা শোনার পরই ঘাটে গিয়ে নৌকায় বসে বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করেছেন। এঁরাই সংখ্যায় বেশি। দ্বিতীয় দলটিতে কারও আর্থিক সচ্ছলতা ও সামাজিক মর্যাদা আছে, কারও তা নেই। কিন্তু তাঁদের সবারই প্রাণে এক অজানা অভাববোধ—যেটি মেটাতে সংসার অক্ষম, অথচ কী চাই তা ঠিক জানা নেই। সেটি জানার জন্যই বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের কাছে আনাগোনা। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''মনে কর খুলিতে একখুলি রস রয়েছে আর তুই মাছি হয়েছিস। কোথা বসে রস

খাবি বল? নরেন্দ্র বললে, 'আমি খুলির আড়ায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব!' " এইটি হল দ্বিতীয় দলটির ভাব। অর্থাৎ সংসারে দৃঢ়ভাবে পা দুটি স্থাপন করে গলা বাড়িয়ে যতটা ঈশ্বরীয় রস আস্বাদন করা যায়। তাঁদের আশঙ্কাটি নরেন্দ্র ব্যক্ত করেছিলেন ওই কথারই রেশ ধরে : ''কেন না বেশি দূরে গেলে ডুবে যাব।'' ঈশ্বরীয় রসাস্বাদনের ভরসায় সংসার থেকে পা দুটি তুলে নিলে অনিশ্চয়তার আশঙ্কাতেই মারা যাব। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ''বাবা, এ সচ্চিদানন্দ-সাগর—এতে মরণের ভয় নাই, এ-সাগর অমৃতের সাগর।'' কিন্তু সংসারী ভক্তদের তা বিশ্বাস হয় না; আর সে-বিশ্বাসটুকু দেওয়ার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের আকর্ষণ করেন। তৃতীয় দলটি নিত্যশুদ্ধ জন্ম-বৈরাগ্যবান বালকের দল, যাঁদের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, তাঁদের এটুকু জানলেই হল—তিনি কে, তাঁরা কে, এবং তাঁর সঙ্গে তাঁদের কী সম্পর্ক। এটুকু জানলেই তাঁরা হয়ে উঠবেন অবতারের ভাবাদর্শ প্রচারের যন্ত্র।

মাস্টারমশাই সংসারদহনে প্রায় দগ্ধ হয়ে পৌঁছেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। সাধারণত ছুটির দিনে তিনি আসেন, কারণ তিনি সংসারী, তাঁকে উপার্জনের কারণে পরের দাসত্ব করতে হয়—তা যতই সম্মানজনক হোক। ছুটির দিন সংসারী ভক্তদের ভিড়, তাই কথামৃত মূলত সংসারী ভক্তদের অধ্যাত্মদিশা প্রদর্শনের কথামালা। তৃতীয় ধারার বৈরাগ্যবান বালক ভক্তদের উদ্দেশে প্রদত্ত উপদেশ পঞ্জীকৃত হয়নি, শ্রুতি হিসেবেই প্রচলিত, কোথাও বা বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত। বর্ণপরিচয় বা সহজপাঠের ছাত্রকে যেমন উচ্চতর বিজ্ঞানের সূত্রগুলি বোঝানো সম্ভব নয় তেমনই অধ্যাত্মপথে সবে পা-রাখা সংসারী ভক্তদের কাছেও উচ্চতর অধ্যাত্ম- বিজ্ঞানলাভের সূত্রগুলি উপস্থাপন নিরর্থক। শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষকশিরোমণি, তাই কখনও তা বলার বা বোঝানোর চেষ্টাও করেননি। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন : ''ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।/ যোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥'' অধ্যাত্মবিজ্ঞানী সংসারে আসক্ত ব্যক্তিদের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটাবেন না, অর্থাৎ যা তারা বুঝতে পারে না সেরকম উপদেশ দেবেন না, বরং 'আপনি আচরি ধর্ম' তাদের সেইরকম আচরণে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গার্হস্থ্য জীবন, তাঁর স্ত্রীগ্রহণ, চাকুরীজীবন, তাঁর দক্ষিণেশ্বর বাসের প্রতিটি পদক্ষেপ সংসারীদের সেই বিশ্বাসটি দেওয়ার উদ্দেশ্যে, যে-বিশ্বাসে আড়া থেকে মুখ না বাড়িয়ে রসসমুদ্রে অবগাহনের ইচ্ছা জাগে।

সেযুগে ধর্ম অর্থে সংসারীদের আচার ধর্ম। ব্রাহ্মধর্ম অসংখ্য দেবদেবী পূজা-অর্চনার ভেদদ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে এক সগুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্তিত করলেন বটে কিন্তু তা অনেকটাই খ্রিস্টধর্মের অনুকৃতি এবং নৈতিকতামূলক। জীবনে একটু সংযম, আচরণে নৈতিকতা, খ্রিস্টানদের মতন সমবেত উপাসনা, মঞ্চ থেকে আচার্যের উপদেশ ও সমবেত বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণের সঙ্গে ঈশ্বরে ভক্তির প্রার্থনা। সংসারের সঙ্গে কোনও বিরোধ নেই, দুইই চলতে পারে। তাঁরা বলতেন, ''আমাদের জনক রাজার মত।'' কিন্তু একথা বললেই 'ফস করে' জনক রাজা হওয়া যায় না, সে-অবস্থা যে বহু তপস্যার ফল—তা শ্রীরামকৃষ্ণ বললেও তাঁরা বুঝতে পারেন না। তাই গভীরতাহীন ভাবাবেগপূর্ণ প্রার্থনা : ''হে ঈশ্বর,... যেন আমরা ভক্তি-নদীতে একেবারে ডুবে যাই...।'' এটি শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বলেছিলেন, ''ভক্তি-নদীতে যদি একেবারে ডুবে যাবে, তাহলে চিকের ভিতর যাঁরা রয়েছেন, ওঁদের দশা কি হবে?'' ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় 'কেশবচরিত' গ্রন্থে লিখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের সংস্পর্শে এসে শিখেছেন যে সংসারে থেকেও ধর্ম হয়। এ-প্রসঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উঠলে তিনি বললেন, ''এ-দিকের আনন্দ পেলে

ওটা ভাল লাগে না, ভগবানের আনন্দলাভ করলে সংসার আলুনী বোধ হয়।... বলে দুদিক রাখব। দুআনা মদ খেলে মানুষ দুদিক রাখতে চায়,... ঈশ্বরের আনন্দ পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। তখন কামিনী-কাঞ্চনের কথা যেন বুকে বাজে।" ব্রাহ্মসমাজের সংসারে ধর্ম আর শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মের সংসার এক নয়। দ্বিতীয়টি কেরানির জেল খেটে বেরিয়ে ফের কেরানিগিরি জুটিয়ে নেওয়া, জলের ওপর নৌকা ভাসানো, সে-সংসার ভক্তিলাভের পর সংসার, যেখানে ভক্ত সংসারে থাকে কিন্তু ভক্তের মধ্যে সংসার থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ উদাহরণ দিলেন নিজের, বললেন, ''ঈশ্বরলাভের পর যে সংসার সে বিদ্যার সংসার। কামিনী-কাঞ্চন তাতে নাই, কেবল ভক্তি, ভক্ত আর ভগবান। আমারও মাগ আছে, —ঘরে ঘটিবাটিও আছে,—হরে প্যালাদের খাইয়ে দিই, আবার যখন হাবীর মা এরা আসে এদের জন্যও ভাবি।"

পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ করে বলতেন, ''ত্যাগ ছাড়া কিছু হবেনি বাপু।" এই ত্যাগ শব্দটিই সংসারীর পক্ষে এক ভয়োদ্রেককারী শব্দ। কিন্তু ত্যাগ মানে তো সব কিছু ছেড়ে শূন্য নিরালম্ব হয়ে পড়া নয়। কিছু গ্রহণ করে বা করার চেষ্টায় কিছু ত্যাগ। তবে আমাদের প্রবল আকর্ষণ সংসারে, অতি ক্ষীণ আকর্ষণ ঈশ্বরে; তাই এদিক ত্যাগ করে ওদিকে এগোনোর কথা ভাবলেই মন বিদ্রোহী হয়ে পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ত্যাগের কথাই বলেন কিন্তু এমনভাবে বলেন যে সংসারীদের মনে হয় তিনি অনেকটা যেন ছাড় দিলেন আমাদের। যেমন নবদ্বীপ গোস্বামীকে বললেন, ''তোমরা গোস্বামী, তোমাদের ঠাকুর সেবা আছে,— তোমাদের সংসার ত্যাগ করলে চলবে না। তাহলে ঠাকুর সেবা কে করবে? তোমরা মনে ত্যাগ করবে।"

বাহ্য ত্যাগের বদলে মনে ত্যাগের কথা সংসারীদের প্রায়ই বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এই আশ্বাসে সংসারীদের বোধ হত তাঁদেরও হবে। কিন্তু সত্যিই কি তিনি ছাড় দিতেন? গোস্বামীকে দেওয়া উপদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ দুবার ঠাকুরসেবার উল্লেখ করলেন। এখন যদি উপদেশটি ঠিক অনুধাবন করা যায় তাহলে আমরা দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন— সংসারে থাকো শুধুমাত্র ঠাকুরসেবার জন্য অর্থাৎ প্রতিপদে বিচার আনো যে ভোগের জন্য সংসার করছি না, ঠাকুরসেবার ব্যাঘাত হবে বলে সংসারে আছি। ভবতারিণীর সেবায় গদাধরের রামকৃষ্ণে উত্তরণ, তাই এটি ঠিক ঠিক পালিত হলে কী হতে পারে সেটিই বিচার্য। মনে ত্যাগ সম্বন্ধেও একই কথা। আমরা ভাবতে পারি—আমরা মনে সংসার-আসক্তি ত্যাগ করেছি, নেহাত সংসারে আছি তাই কর্তব্য হিসাবে এগুলি করছি। কিন্তু যিনি এই উপদেশটি মর্মে গ্রহণ করবেন তাঁর পরীক্ষার ইচ্ছা হবে সংসারের বাইরে গিয়ে মনকে যাচাই করার। শ্রীম অদ্ভুত মেধাসম্পন্ন, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ঠিক ঠিক বুঝে নিতেন, তাই প্রথম সুযোগেই প্রায় একমাস ঘর ছেড়ে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্নিধানে বাস করলেন, এই বাস তাঁকে এতটাই এগিয়ে দিয়েছিল যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, ''এখন গিয়ে বাড়িতে থাকো—তাদের জানিও যেন তুমি তাদের আপনার। ভিতরে জানবে তুমিও তাদের আপনার নও, তারাও তোমার আপনার নয়।" পরিণত বয়সেও মাস্টারমশাই মনকে যাচাই করে যাচ্ছেন। তখন তিনি স্কুলের অধ্যক্ষ, সমাজে এবং ভক্তমণ্ডলীতে সম্মাননীয়, রাত্রে একটি মাদুর বগলে সেনেট হাউসের বারান্দায় বা ফুটপাথে শুতে যাচ্ছেন, নিজেকে নিঃসঙ্গ অনিকেত ভাবনার পরীক্ষায়। পরীক্ষিত না হলে মনের কোনও ভাবনাই সত্যের রূপ ধারণ করে না।

আসলে ত্যাগ তো মনেই। বাহ্য ত্যাগ তারই প্রকাশ। শুধু বাহ্য ত্যাগ কপটাচরণ, তাই গীতা

বলছেন ''কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য যঃ আস্তে মনসা স্মরন্।/ ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে॥'' (৩/৬) বাইরে সংযম অথচ মনে ভোগের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকা মিথ্যাচারিতা। স্বামী তুরীয়ানন্দজী ত্যাগ সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠের একটি গল্প উদ্ধৃত করে একটি পত্রে ২১/৭/১৭ এক ভক্তকে দিঙ্‌নির্দেশ দিচ্ছেন—''যোগবাশিষ্ঠে ত্যাগের একটি গল্প আছে। কোনও ব্রহ্মচারী আপনাকে ত্যাগী মনে করে সমস্ত বাহ্যিক ত্যাগ করে অতি সামান্য বস্ত্র, আসন, কমণ্ডলু লয়ে থাকতো। তাহার গুরু তাহার চৈতন্য করাবার জন্য তাকে বললেন, তুমি কি ত্যাগ করেছ? কিছুই তো ত্যাগ কর নাই। ব্রহ্মচারী ভাবলে, আমার তো কিছুই নাই, মাত্র পরিধানবস্ত্র, আসন ও কমণ্ডলু আছে। গুরুদেব কি এই সকল মনে করিতেছেন? এই ভাবিয়া ব্রহ্মচারী ঐ সকল ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করতঃ সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতে একে একে ঐ সমস্ত বস্তু অর্পণপূর্বক বলিল, এইবার আমার সমস্ত ত্যাগ হইয়াছে। গুরু বলিলেন, তোমার কী ত্যাগ হইয়াছে? বস্ত্র? উহা তো তুলা হইতে নির্মিত; এইরূপ আসন, কমণ্ডলু প্রভৃতি—উহারাও বিভিন্ন বস্তু হইতে নির্মিত, উহাদের ত্যাগ করিয়া তোমার কি ত্যাগ হইল? তখন ব্রহ্মচারী ভাবিল, আমার আর কি আছে? অবশ্য আমার শরীর আছে। আচ্ছা, এই শরীরকে আহুতি দিব। এই স্থির করিয়া যখন ব্রহ্মচারী সম্মুখস্থ অগ্নিতে আপনার শরীর অর্পণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল, তখন তাহার গুরুদেব বলিলেন—অপেক্ষা কর, কি করিতেছ বিচার কর দেখি, এ শরীরে তোমার কি আছে? ইহা তো পিতামাতার শুক্রশোণিতে উৎপন্ন এবং আহার দ্বারা বর্ধিত ও পুষ্ট ইহাতে তোমার কি? তখন ব্রহ্মচারীর চক্ষু উন্মীলিত হইল। গুরুকৃপায় তখন সে বুঝিতে পারিল যে মাত্র অভিমানই যত অনিষ্টের মূল। এই অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলেই ঠিক ঠিক ত্যাগ হয়, নচেৎ বাহ্যিক বস্তু এমন কি শরীর পর্যন্ত ত্যাগ করিলেও কিছুই ত্যাগ করা হয় না।''

তাই মনে ত্যাগের সাধনপথে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের তিনটি অব্যর্থ উপদেশ—তাঁর নামগুণগান, সাধুসঙ্গ ও মাঝে মাঝে নির্জনবাস। নির্জনবাসে যেমন ঈশ্বরচিন্তার অবাধ সুযোগ মেলে তেমনই নিজের মনকে কাছ থেকে দেখা যায় ও তার চাতুরী ধরা পড়ে। ত্যাগ বাহ্যই হোক আর মনেই হোক নির্জনবাস তার নিরিখ, যাচাইয়ের কষ্টিপাথর। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা বিভিন্ন ভক্তের জন্য বিভিন্ন এবং তার ভাব অনুযায়ী; কিন্তু তার উপদেশের আপাত ছাড় বস্তুত কোনও ছাড় নয়, যা শুধুমাত্র গভীর অনুধাবনেই ধরা পড়ে। ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়ে ফেরার পথে তাঁকে বলছেন, ''সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীর ভক্ত। ভগবান বলেন, যে সংসার ছেড়ে দিয়েছে সে তো আমায় ডাকবেই,... আর যে সংসারে থেকে আমায় ডাকে—বিশ মণ পাথর ঠেলে যে আমায় দেখে সেই-ই ধন্য, সেই-ই বাহাদুর, সেই-ই বীরপুরুষ।'' কথাগুলি সংসারীদের বুকে বল আনে, ধর্মের সাধনপথে তাদেরও যে একটা অবস্থান, একটা মহত্ত্বপূর্ণ স্থিতি আছে, এই স্বীকৃতিতে তাদের হীনম্মন্যতা কাটে। উপস্থিত ভাগবতের পণ্ডিত তাই উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে ওঠেন : ''শাস্ত্রে তো ওই কথাই আছে।'' ধর্মব্যাধের ও পতিব্রতার কথা এবং সেই কাহিনি উপস্থিত সবাইকে শোনাতে বসেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কথাটি সংসারজীবনের হীনম্মন্যতা কাটাতে সাহায্য করলেও এটি পর্যালোচনা করলে একটি বিশেষ ইঙ্গিতের খোঁজ মেলে। ''সংসারে থেকে... বিশ মণ পাথর ঠেলে যে আমায় দেখে সেই ধন্য।'' প্রশ্ন ওঠে—সংসারীদের কজনের মনে বিশ মণ তো দূরের কথা আদৌ সংসারকে বোঝা বলে মনে হয়? দুর্ভোগের সংসারে ভোগ সামান্য হলেও সে-সংসার বোঝা হয়ে ওঠে না কখনও,

আর যদিও বা হয় তা একটি মনোমতো সংসার না হওয়ার কারণে। ''ধন্য আশা কুহকিনী তোমার মায়ায়/ অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি''—এটি জানা থাকলেও এর মর্ম উপলব্ধি করে খুব কম মানুষ। তাই যিনি এই ঘূর্ণায়মান সংসারচক্রের হাত থেকে অব্যাহতি চান, একমাত্র তিনিই এই সংসারকে বিশমণি বোঝা বলে অনুভব করেন এবং এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সেই বিশমণি বোঝা ঠেলে ঈশ্বরকে পেতে চেষ্টা করেন। মনের মধ্যে পোষা সংসার যখন বিশমণ বোঝা বোধ হয় এবং ঈশ্বরকে জানার, পাওয়ার আশায় সে যখন মনের বাধাস্বরূপ এই বোঝাকে ঠেলে সরিয়ে ভগবানকে দেখার চেষ্টা করে ''সেই-ই ধন্য, সেই-ই বাহাদুর, সেই-ই বীরপুরুষ।'' এ যে কতবড় কঠিন কাজ তা সাধকমাত্রই—তা গৃহীই হোন বা ত্যাগী—নিশ্চিতরূপে জানেন। ত্যাগী-গৃহী-নির্বিশেষে এই পৌরুষ, এই বীরত্ব, এই বাহাদুরি তাই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশংসা পায়, ত্যাগের মূল্য হ্রাস করে নয়।

শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছিলেন, ''এবারে দেখালেন ত্যাগ।'' বস্তুত কোনও একটি বিশেষ ভাব নয়, পরন্তু প্রতিটি ভাবের যে-অন্তর্নিহিত ভিত্তি, যার উপর ভাবের পুষ্টি নির্ভর করে সেই ত্যাগ ও ব্যাকুলতা দিয়ে গেলেন মনুষ্যসমাজকে। সেই ত্যাগও নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক—তিনি বলেছেন, পুবে যত এগোনো যাবে, পশ্চিম তত পিছনে পড়ে থাকবে, আবার গঙ্গার দিকে যত যাওয়া যাবে ততই শীতল অনুভূতি হবে। ''ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ''— ঈশ্বরকে ভালবাসার পথে এগোলে ভক্তিবৃদ্ধি, তাঁর অস্তিত্বের অনুভব আর বিষয়ে বিরাগ একইসঙ্গে আবির্ভূত হতে থাকে। সর্বোপরি সকলের জন্য একই মাপের, একই রঙের জামা নয়, একই পথের নিশানা নয়—জগতে যতরকম ভাব সম্ভব, সব ভাবেরই স্থান রইল তাঁর কাছে। চিরন্তন মাতৃভাবে ভাবিত শ্রীরামকৃষ্ণ জগদ্ব্যাপী তাঁর সমস্ত সন্তানদের রসনার উপযোগী রান্না করে রেখে গেলেন, যার যা পেটে সয়। এ-তাবৎ জগৎ তার ইতিহাসে গৃহস্থের এতবড় বন্ধু, এতবড় আশ্রয় আর দেখেনি। ✠

শ্রীসারদা মঠ থেকে প্রকাশিত হল

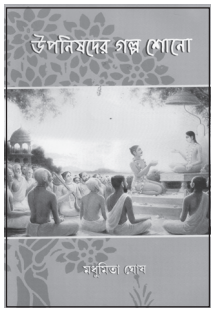

স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন বনের বেদান্তকে ঘরে আনতে। আজ ঘরে ঘরে আমাদের শিশুরা জানুক, উপনিষদে কী রত্ন আছে। শিশুর চোখে-মনে জেগে উঠুক অতীতের উপকরণহীন অথচ মহিমময় জীবনের মধুর শান্ত ছন্দ। সেই প্রয়াসেরই ফল **'উপনিষদের গল্প শোনো'**। শিশুদের আকর্ষণীয় করে উপনিষদের গল্পগুলি পরিবেশন করেছেন অধ্যাপিকা ড. **মধুমিতা ঘোষ**।

মূল্য : ৫৫ টাকা